৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

আলোচনা সভা এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ

প্রতি বছরের মতো এবছরও ১৫ই আগস্ট রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয় কর্মচারী ভবনে। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগঠনের সভাপতি মানস দাস। এই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অরবিন্দ সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার বিষয় ''স্বাধীনতার মর্মবস্তুকে রক্ষা করো''। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রী বাসব বসাক মহাশয়। আলোচনা সভার শুরুতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। আলোচক শ্রী বসাক তাঁর বক্তব্যে বিগত দশ-এগারো বছরে যেভাবে বার বার আমাদের দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর চারটি স্তম্ভের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি তথা বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথাও তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক-কর্মচারীদের উজ্জ্বল ভূমিকার কথাও তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে উঠে আসে। আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদল যেভাবে দেশের গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে তা বার বার আলোচনায় উঠে আসে। কেন্দ্রের বর্তমান সরকার যেভাবে জাতীয়তাবাদের আড়ালে আসলে হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, সে কথাও তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। শ্রী বসাক বলেন যে হিন্দু, মুসলিম সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যেভাবে একসাথে মিলে দেশের জন্য স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, আজ সেই স্বাধীনতার মর্মবস্তুকেও একইভাবে সকলে মিলে রক্ষা করার অঙ্গীকার আমাদের নিতে হবে। দ্বিতীয় পর্বে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করা হয় কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিমের পক্ষ থেকে। কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ

বাসব বসাক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়। গান, আবৃত্তি, নৃত্য, হরবোলা, গল্পপাঠের সমন্বয়ে গড়া এই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সন্দীপ দত্ত, মণিশংকর মণ্ডল, নন্দিনী ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়, পাপিয়া মণ্ডল, মিতালী সাহা, সঞ্জীব ঘোষ, কুমকুম ঘোষ, মানস দাস, শিশুশিল্পী তিশা কোলে, কর্মচারী পরিবারের কন্যা অনুষ্কা সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে মেঘ মুলুকে নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পরিবেশিত হয় নাটক 'গল্পের ঝুলি'। সমগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন

নৃত্যানুষ্ঠান

সংগীতানুষ্ঠান

সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। □

১২ই জুলাই কমিটির বিক্ষোভ সমাবেশ ও ডেপুটেশন

বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর '২৫ কলকাতা ও শিলিগুড়ি, রাজ্যের দু'প্রান্তে ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে ২০ দফা দাবিতে মিছিল, সমাবেশ ও ডেপুটেশনে শামিল হলেন রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। আর জি কর হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচারের দাবি করার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা সমস্ত দপ্তরে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, সমস্ত ক্ষেত্রের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ সহ ২০ দফা দাবিতে দক্ষিণবঙ্গে বিধানসভা অভিযান এবং উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যা অভিযানে শামিল হন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারী ও পেনশনার্সরাও।

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে কলকাতায় বিধানসভা অভিযান কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যোগাযোগ ভবন থেকে কেন্দ্রীয় মিছিল বেলা ২টায় পথ চলা শুরু করে। রানী রাসমণি এভিনিউতে পুলিশের তিনটে ব্যারিকেড মিছিলকে আটকে দিলেও সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভ আয়োজিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভাপতি অনাদি সাহু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। একটি প্রতিনিধিদল বিধানসভায় গিয়ে অধ্যক্ষের কাছে দাবি সম্বলিত প্রস্তাব তুলে দেন।

উত্তরকন্যা অভিযানের মিছিল শুরু হয় শিলিগুড়ির এস এফ রোডে ফায়ার ব্রিগেডের সামনে থেকে। এই মিছিলে উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলার শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও পেনশনার্সরাও শামিল হন। মিছিল নৌকাঘাট পার হয়ে তিনবাত্তি মোড়ের দিকে এগোতেই পুলিশ বাধা দেয়। বাঁশের বিশাল ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেওয়া হয়। সেখানেই বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। □

বছর পার—বিচার পেল না অভয়া

গত বছরের ৮ আগস্ট রাত্রে আর জি কর হাসপাতালে এক মহিলা ডাক্তারকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন করার ঘটনার পর এক বছর পেরিয়ে গেলেও সেই মহিলা ডাক্তার তথা অভয়া আজও বিচার পেল না। এই এক বছর দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' বা 'তোমার আমার একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আর জি কর'—এই ধরনের স্লোগানে মুখরিত হয়ে রাজপথে ছিলেন অভয়ার বিচারের দাবিতে। সিবিআই তদন্তভার নিলেও তার কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি, বরং রাজ্য পুলিশের তালেই তাল মিলেছে তাদের তদন্তের। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভয়ার ধর্ষণ ও হত্যার এক বছর পর অভয়া মঞ্চের আহ্বানে কলকাতায় পুনরায় রাজপথের দখল নিল আমজনতা।

গত ৯ আগস্ট, ২০২৫ গোটা রাজ্য দেখল আরও এক গণজাগরণ। অভয়া মঞ্চের 'কালিঘাট চলো' অভিযানে প্রতিবাদ, ক্ষোভ, স্রোতের আরও এক নতুন চেহারা ফুটে উঠল হাজরা মোড় চত্বরে। বক্তব্য, প্রতিবাদী গান, কবিতায় মুখরিত হয়ে উঠল সেই চত্বর। জমায়েত থেকে প্রশ্ন উঠল—'আর কত বিচারহীন, নিদ্রাহীন রাত কাটবে?' শপথ নিল জনতা—অভয়ার ওই নৃশংস

হত্যাকারীদের এবং হত্যার চক্রান্তকারীদের বাংলা ছাড়া করতে হবে। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের কালীগঞ্জের শাসকদলের ছোড়া বোমার আঘাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত দশ বছরের ছোট মেয়ে তামান্নার মা। তিনি বলেন, 'আমিও মা, অভয়ার মা-ও একজন মা। আমাদের মেয়েকে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জী। আমাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিন আপনি।'

হাজরা মোড়ে পুলিশের বিশাল ব্যারিকেডের সামনে ঐদিন দুপুর থেকেই মানুষের ভিড় জমতে থাকে। বিকেল চারটের সময় হাজরার চৌমাথার প্রতিটি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অভয়া মঞ্চের পক্ষ থেকে ড. পুণ্যব্রত গুণ, ড. তমোনাশ চৌধুরী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরাতুন নাহার, বাদশা মৈত্র, শ্রীলেখা মিত্র, দীপালি ভট্টাচার্য, পল্লব কীর্তনীয়া প্রমুখ। ড. তমোনাশ চৌধুরী বলেন, 'আজকে ওই খুনিদের বাংলা ছাড়া করার শপথ নেওয়ার দিন। ধর্ষকদের বাঁচিয়ে আর কতদিন পার পাবে প্রশাসন? আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।' অভয়া মঞ্চের আহ্বানে 'কালিঘাট চলো' অভিযানে 'জনচেতনা মঞ্চ'-এর ব্যানারে শামিল ছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী বৃন্দ। □

সংগ্রামী হাতিয়ার
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
তেপান্নতম বর্ষ □ চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা □ মূল্য ঃ ৪ টাকা

সম্পাদকীয়

দুনিয়া জোড়া প্রতিবাদে অবশেষে পিছু হটলো ইজরায়েল

ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল মানুষের প্রতিবাদ। দেশে দেশে এমনকি ইজরায়েলের মদতদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে সাধারণ মানুষ। অবশেষে বন্দিবিনিময় ও গাজায় ত্রাণসামগ্রী প্রবেশ সহ আরও কিছু শর্তে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল ও হামাস। এই ঘোষণার পর টানা দু'বছর মৃত্যুমিছিল দেখা গাজা মেতে উঠেছে স্বস্তির উৎসবে।

বিগত ছ'বছর ধরে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে ৭০ হাজার সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলী জেনোসাইডে মৃত্যু হয়েছে ২০ হাজার নারী ও শিশুর। বেছে বেছে আক্রমণ চালানো হয়েছে ত্রাণ শিবিরগুলিতে এমনকি হাসপাতালেও। দুঃখের বিষয় হল ইজরায়েলের এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে কি রাষ্ট্রসংঘ, কি কূটনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জুনিয়র পার্টনারে পরিণত হতে চাওয়া মোদি সরকার অত্যন্ত নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে ৫৬ ইঞ্চি ছাতি।

মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েল প্যালেস্তিনীয়দের উপর যে জেনোসাইড চালিয়েছে যা আপাতত আন্তর্জাতিক চাপে স্থগিত আছে, সেই জেনোসাইডকে গোটা বিশ্বের কাছে ঔদ্ধত্যের সাথে বার বার ঘোষণা করেছে। ইজরায়েলের কর্তাব্যক্তিরা একাধিকবার বলেছে যে এই গণহত্যায় নারী-শিশু কাউকে রেয়াত করা হবে না। যুদ্ধের সমস্ত প্রোটোকলকে উড়িয়ে দিয়ে নির্বিচারে সাংবাদিক হত্যা করা হয়েছে। গত ১০ আগস্ট ৭ জন ও ২৫ আগস্ট আরও ৫ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীকে হত্যা করেছে ইজরায়েল। একটি তথ্যসূত্র অনুযায়ী অক্টোবর ২০২৩ থেকে আজ পর্যন্ত দেশ নির্বিশেষে ২৭০ জন সাংবাদিককে খুন করা হয়েছে তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নামে। ইজরায়েলের অপ্রকাশিত বক্তব্য যেন এটাই যে প্রত্যেক ফিলিস্তিনি সাংবাদিকই সন্ত্রাসবাদী।

এই ধরনের বক্তব্য ইজরায়েলী স্বৈরাচারীদের পক্ষ থেকে মোটেও নতুন নয়। গোটা বিশ্বের কাছে ফিলিস্তিনিদের সকলকে বর্বর, সন্ত্রাসবাদী, হামাসের মদতদাতা হিসেবে পরিচিতি দিতে চেয়েছে। পাশে থেকেছে পশ্চিমী প্রচার মাধ্যম। ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইসাক হেরজোগ বলেছিলেন, ''গাজার সমস্ত অধিবাসী হামাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করলে তাদের সকলকেই এর দায় নিতে হবে। এর মানে দাঁড়ায় সকল গাজাবাসী ইজরায়েলের কাছে দোষী বা অপরাধী। এভাবে একটা এলাকার সমগ্র মানুষকে বা গোটা একটা জাতিকে অপরাধী হিসাবে কোনো কারণ ছাড়া দেগে দেওয়াটাও চরম অপরাধ। আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ব্রিটেনে অবস্থিত ইজরায়েলী রাষ্ট্রদূত জি বি হোটোভেলি ২০২৪-এর জানুয়ারিতে বলেছিলেন যে—গাজার প্রতিটি বিদ্যালয়, প্রতিটি ধর্মস্থান, একটা অন্তর একটা বাড়িতে সুড়ঙ্গ যোগাযোগ আছে। এর জন্যই গোটা গাজা ভূখণ্ড ইজরায়েলী মিলিটারিদের লক্ষ্য। এখানেই শেষ নয়, এই ধরনের নৃশংসতার পক্ষে যুক্তিও তারা একতরফা ভাবে তুলে ধরেছে এবং গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে একের পর এক ইজরায়েলী মাতব্বরগণ। ইজরায়েলী আইন সভা নেসেট-এর প্রাক্তন সদস্য মসো ফেলিগলিন গত মে মাসে নির্বিকারভাবে বলেছেন—গাজার প্রতিটি বাচ্চা একজন শত্রু। তাই গাজার কোনও শিশুকে ছাড়া হবে না। কোনো সভ্য মানুষ এই ভাষায় কথা বলতে পারে কি?

এই ধরনের বিকৃত প্রচার করে জেনোসাইড চালানো হচ্ছে শুধু নয়, সেখানে ব্যাপকভাবে পরিকাঠামো ধ্বংস করা হচ্ছে। ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস্ মনিটর রিপোর্ট নামক একটি সংস্থার সমীক্ষা বলছে যে গাজার ৭০ শতাংশ পরিকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে ইজরায়েলী বাহিনী।

ফিলিস্তিনিদের সমস্ত দিক দিয়ে ধ্বংস করাটাই ইজরায়েলের উদ্দেশ্য। নারী শিশু সহ অগণিত নিরাপরাধ মানুষ শুধু নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা করা হচ্ছে বিজ্ঞানী, ডাক্তার, শিল্পী, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের। একটি জাতির মেরুদণ্ড তার শিক্ষা ব্যবস্থা। ইজরায়েল, প্যালেস্তাইনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চুরমার করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে সেখানকার ৯৭ শতাংশ শিক্ষা পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত। তার মধ্যে ৯১ শতাংশর ক্ষেত্রে হয় বড় ধরনের মেরামত অথবা পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর পাশাপাশি হত্যা করা হয়েছে অগণিত শিক্ষককে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ফিলিস্তিনিরা শিক্ষাকে জাতি গঠনের হাতিয়ার হিসাবে শুধু নয়, মুক্তি সংগ্রামের ও আত্মপ্রত্যয়ের হাতিয়ার হিসাবেও দেখে। এই কারণে ১৯৪৮-এ নাকবা-র পর থেকে প্যালেস্তাইনে শিক্ষায় বড় ধরনের বিনিয়োগ হয়েছে। বর্তমান সময়েও এমন ছবি দেখা গেছে যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্তাইনে ছাত্র পড়ানো হচ্ছে খোলা আকাশের নীচে অথবা অস্থায়ী কোনো ছাউনিতে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এত বেশি নজর দেওয়ার আরেকটি কারণ হলো জায়নবাদী ইজরায়েলের পক্ষে ওকালতি করা পশ্চিমী গণমাধ্যম বরাবর এটা প্রচার করে যে আরব জাতি ইজরায়েলীদের থেকে বিচারবুদ্ধি, শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। এই ধরনের প্রচারজাত একটি হীনমন্যতাবোধও ফিলিস্তিনিদের একদম গ্রাস করেনি তা নয়।

পশ্চিমী গণমাধ্যম ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে প্রচার এবং প্যালেস্তাইনের প্রতি ন্যায্যত সহানুভূতিশীল দেশগুলিকে সন্ত্রাসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে দেগে দেয়। এই ধরনের প্রচারে উৎসাহিত হয়ে অধুনা নিষিদ্ধ ইজরায়েলী চরমপন্থী সংগঠন জিউরিশ ডিফেন্স লীগ বিশ্ববিখ্যাত ফিলিস্তিনি বিদ্বজন এডওয়ার্ড সৈদ-কে নাজি বলে আখ্যা দিতেও দ্বিধা করে না।

এতটা একতরফা ও বিকৃত প্রচার সত্ত্বেও প্যালেস্তাইন তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সমস্যা তৈরী করেছিল ইজরায়েলে। বিগত প্রায় ১০০ বছর ধরে জায়নবাদের যে অগ্রগতি ঘটেছিল—এত স্বৈরাচার, গণহত্যা, ধ্বংসলীলার পরও গাজার বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা ফিনিক্স পাখির মতো বার বার জেগে উঠেছে। সেজন্যই এবারে ইজরায়েলী আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল প্যালেস্তাইনের সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ এমনকি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারগণ। এবারের যুদ্ধ ছিল ফিলিস্তিনি চিন্তাবিদদের বিরুদ্ধেও। যে কোনো ধরনের স্বৈরাচারী শক্তি বরাবর এটাই যে করেছে ইতিহাস তার সাক্ষী আছে।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই স্বৈরাচার একদিন পিছু হটে। বর্তমানে ইজরায়েল গোটা দুনিয়ার চাপের কাছে নতিস্বীকার করে যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। তবে যুদ্ধ বিরতির কয়েকদিনের মধ্যেই বিনা প্ররোচনায় আবার আক্রমণ শুরু করেছে ইজরায়েল। বিশ্বজুড়ে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদে পুনরায় সোচ্চার হয়ে উঠছে মানুষ। □

২৭ অক্টোবর, ২০২৫

শোক সংবাদ

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব অনুনয় চট্টোপাধ্যায় চিরবিদায় নিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। বিধাননগরে একটি বেসরকারী হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে গত ১৮/০৮/২০২৫ সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর জীবনাবসান হয়। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, নাট্যকার সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা ও সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৮ সালে অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলায়। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে এসে দমদম পার্ক অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। কিশোর বয়স থেকেই দমদম অঞ্চলের বামপন্থী আন্দোলনের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। কিশোর বয়স থেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে তিনি সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৬৪ সালে একদল তরুণ সাহিত্যকর্মীদের উদ্যোগে শুরু হয় 'নন্দন' পত্রিকা, যার অন্যতম চালিকাশক্তি ছিলেন তিনি। গত শতাব্দীর সাতের দশকে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময় লেখক-শিল্পী- কলাকুশলীদের সংঘবদ্ধ করার কাজে অন্যতম সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি।

কর্মজীবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্মী ছিলেন। পরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রথম সচিব ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমির নানাবিধ কর্মকাণ্ডে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। সংস্কৃতির ভুবনে অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'জীবনশিল্পী সুকান্ত', 'গোর্কির জীবন—গোর্কির আখ্যান', 'মার্কস ও মার্কসবাদ', 'মার্কসবাদ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি অপ্রিয় রায় ছদ্মনামে 'ভারতের চীনযুদ্ধ' নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

পরিবারে এক পুত্র ও পুত্রবধূ বর্তমান। □

সুকান্ত চৌধুরী

দীনেশ ডাকুয়া

প্রয়াত হলেন বামফ্রন্ট আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। বুধবার ২০-০৮-২০২৫ সকাল ১১.১০ মিনিট নাগাদ কলকাতার এন.আর.এস হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ছিলেন কোচবিহার জেলার বামপন্থী আন্দোলনের প্রবীণতম সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা।

১৯৩৫ সালের ২৬ জুন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার শিকারপুরে বারঘরিয়া গারকুটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া। বাবা ভুবনমোহন ডাকুয়া ও মা কুসুমকুমারী ডাকুয়ার তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান। জোতদার পরিবারের সন্তান হলেও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে তিনি মাথাভাঙা হাইস্কুল ও কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজ অধুনা এ.বি.এন. শীল কলেজে পাঠ শেষ করে কলকাতায় পড়াশোনা করেন। ১৯৫০ সালে কোচবিহার রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন দীনেশ ডাকুয়া। কোচবিহারে তেভাগার লড়াই, বর্গার লড়াই সবেতেই তিনি ছিলেন সামনের সারির নেতা। জোতদারদের অবৈধ জমি উদ্ধারে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভূমিহীনদের আপনজন। ফুলবাড়ি, কেদারহাট, গোপালপুর, বৈরাগীহাট এলাকায় তাঁকে নিয়ে সাম্যের গান বেঁধেছিলেন সেই সময়ের বর্গাদার ও ভূমিহীনরা। পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী কামতাপুরী ও গ্রেটার কে এল ও কার্যকলাপকে রুখতে উত্তরবাংলা জুড়ে মানুষের ঐক্য রক্ষার আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৮৭ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দীনেশ ডাকুয়া একাদিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথমে তফশিলি জাতি উপজাতি দপ্তর, পরে পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে মাথাভাঙা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে এছেন।

দীনেশ ডাকুয়ার মৃত্যুতে সমাজের বিশিষ্ট জনেরা শ্রদ্ধা ও গভীর শোক জ্ঞাপন করেন। শোক মিছিল সহযোগে বৃহস্পতিবার ২২-০৮-২৫ প্রয়াত কমরেড ডাকুয়ার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার এন.জে.এন. মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ে। এখানে তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী মরদেহ মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন তাঁর পুত্র ডাঃ কৌস্তভ ডাকুয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সাহায্যার্থে।

প্রয়াত দীনেশ ডাকুয়ার এক পুত্র, তিন কন্যা ০সহ পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন। □

সুকান্ত চৌধুরী

সম্মেলন অভিমুখে নানা কর্মসূচী

বিকল্প পাঠশালা, জলপাইগুড়ি

বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র, ঝাড়গ্রাম

বইয়ের হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জরুরি অবস্থার ৫০ বছর

বিদ্যুত দাস

আজ থেকে ৫০ বছর আগে ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল ২৫ জুন, ১৯৭৫ সালে। সংবিধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদের ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের আদেশে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার দেশে জরুরি অবস্থা (Emergency) ঘোষণা করে। এটি ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত, ভয়াবহ ও কলঙ্কিত পর্ব। ২০২৫ সালে এর ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ভারতে তিনবার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। প্রথমবার ২৬ অক্টোবর, ১৯৬২ থেকে ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৮ পর্যন্ত, চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে, দ্বিতীয়বার ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এবং তৃতীয়বার, ২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭ পর্যন্ত, দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগ এনে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন।

কেন জারি করা হয়েছিল জরুরি অবস্থা?

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে রায়বেরেলি কেন্দ্রে পরাজিত প্রার্থী রাজনারায়ণ জালিয়াতি করে ভোটে জেতার অভিযোগ করে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করেন। হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধীকে ৫ ঘণ্টা জেরা করেছিল। ১৯৭৫ সালে ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিনহা প্রধানমন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালত তাঁর নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করে এবং লোকসভার আসন থেকে অপসারণ করে। পাশাপাশি পরবর্তী ছয় বছরের জন্য যে কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ইন্দিরা গান্ধী হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান। বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার ২৪ জুন, ১৯৭৫ সালে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন, তবে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

১২ জুন, ১৯৭৫ গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাস্ত হয় এবং কংগ্রেস (সংগঠন) নেতৃত্বাধীন জনতা ফ্রন্ট জয়লাভ করে।

এই দুটি ঘটনায় ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। বিরোধী দলগুলি ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগের দাবি তোলার প্রস্তুতি নিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের বদলে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন।

বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে বলা হয়েছিল দেশের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি ও বাম হঠকারীদের থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে জামাত-ই-ইসলামী, আর এস এস, আনন্দমার্গী ও কিছু নকশালপন্থী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

পাশাপাশি পুঁজিবাদী উন্নয়নের দেউলিয়া অর্থনীতি গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে ধনী আরো ধনী হয়েছে, গরিব আরো গরিব হয়েছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাপক দুর্নীতি, ফাটকাবাজি, বেকারত্ব বৃদ্ধি, কর্মচ্যুতির ফলে মেহনতী মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫-এর জুন মাসের মধ্যে দেশে ৫টি সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যের দাবিতে লক্ষাধিক মানুষ কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলায় জেলায় গ্রেপ্তার বরণ করেন। গণবিক্ষোভ, ধর্মঘট, হরতাল, সভা করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে পুলিশবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ২০ দিনব্যাপী রেল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট দমন করতে ব্যাপক গ্রেপ্তার করা হয়।

THE HINDU
India's National Newspaper

President Proclaims National Emergency

"Security of India Threatened by Internal Disturbances"

Preventive Arrests: Press Censorship Imposed

PM Explains Action

গুজরাটে ৮ মাসব্যাপী আন্দোলন, বিহারের গণআন্দোলন শাসকের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন দমনে ভারত রক্ষা আইনের দানবীয় ধারাগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুন শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং আন্দোলনগুলি দমন করতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন বা পরিবর্তন ঘটে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, বিহারে এই ঘটনা ঘটে। প্রশাসন ও দলে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরী হওয়ার ফলে দলের ভিতর ইন্দিরা গান্ধীর কর্তৃত্বাধীন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সমস্ত ধরনের নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক নীতির ফলে গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সবদিক থেকে আক্রান্ত হতে থাকে এবং ঘরে বাইরে তিনি সঙ্গীহারা হয়ে পড়েন। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে একজন এম.পি ইন্দিরা গান্ধীর পরিবর্তে জগজীবন রামকে দলের নেতা নির্বাচনের পরিকল্পনা করেন।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইন্দিরা গান্ধী চরম স্বৈরতন্ত্রের পথ গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সুপারিশ করেন।

ভারতীয় গণতন্ত্রের কালো অধ্যায় (২৫ জুন, ১৯৭৫-২১ মার্চ, ১৯৭৭)

জরুরি অবস্থায় দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র আক্রান্ত হয়। সমস্ত নাগরিক অধিকার স্থগিত করা হয়। সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ চালু করা হয় (প্রথম পাতায় "This news has been censored" লেখা হত)। বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রমিক সংগঠন, ধর্মঘট, সভা, মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়। ৩৯ জন সাংসদকে গ্রেপ্তার করা হয়, যার মধ্যে কংগ্রেস নেতাও ছিলেন। সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে জোরপূর্বক জন্ম নিয়ন্ত্রণ (ভ্যাসাকটমি) অভিযান চালানো হয়। "এক দল, এক নেত্রী, এক শ্লোগান" কায়েম করা হয়েছিল। ওই সময়ে কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া বলেছিলেন "ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা"। জরুরি অবস্থায় সংবিধান সংশোধন, বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল যেমন—

MISA (Maintenance of Internal Security Act)—এই আইনের চারবার সংশোধন করা হয়। রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, শ্রমিক নেতা সহ অসংখ্য মানুষকে এই আইনে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল।

DIR/DISIR (Defence of India Rules/Defence and Internal Security of India Rules)

পুলিশের হাতে তল্লাশি, গ্রেপ্তার ও সংবাদপত্র দমন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে এই আইনের অপব্যবহার করা হয়।

COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act.)

বিদেশী মুদ্রা পাচার ও চোরাচালান ঠেকানোর নামে রাজনৈতিক বিরোধীদের বিচারহীন আটক করা হয়।

৪২তম সংবিধান সংশোধন

৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছিল। মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সীমিত করা হয়। সরকারের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারগুলি সংকুচিত করা হয়েছিল। সংবিধানে 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সংহতি' শব্দগুলো যুক্ত করা হলেও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস (১৯৭২-১৯৭৭)

জরুরি অবস্থার পূর্বেই ১৯৭২ সালে গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশ দিয়ে জালিয়াতি করে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। পুলিশের পাশাপাশি কংগ্রেস আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনীকে সরকার-বিরোধীদের দমনে কাজে লাগানো হয়। বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা, ঘরবাড়ি পোড়ানো, এলাকাচ্যুত করে গ্রাম দখল করে নেওয়া হয়েছিল। প্রায় ১১০০-এর বেশি গণআন্দোলনের কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল।

গণসঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য সবক্ষেত্রেই দমননীতি চালিয়ে সংস্কৃতির উপর আঘাত করা হয়েছিল। হাজার হাজার কৃষকের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

হাজার হাজার কর্মচারীর হয়রানিমূলক বদলি, এলাকা থেকে উৎখাত, প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চনা, আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসে ৬০ জন কর্মী-কর্মচারীদের হত্যা করা হয়। সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। মিসায় গ্রেপ্তার করা হয় ১৩ জন নেতা সহ ১৬ জন সংগঠককে। ১৪ জনকে বরখাস্ত করা হয় সংবিধানের ৩১১(২)(গ) ধারায়। অফিসগুলিতে ছাত্র পরিষদের দুষ্কৃতিরা হামলা চালায় এবং চেয়ার দখল করে কর্মচারীদের অফিস থেকে বের করে দেয়। ৫০০৯-এফ কুখ্যাত সার্কুলার জারি করে সরকার ধর্মঘটী কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কেড়ে নিয়ে নানা ধরনের আক্রমণ নামিয়ে আনে।

জরুরি অবস্থায় আর এস এস-জনসংঘ

জরুরি অবস্থার সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একমাত্র জনসংঘ ও আর এস এস নেতারাই ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আটক হওয়া আর এস এস প্রধান মধুকর দত্তাত্রয় দেওরস ওরফে বালাসাহেব ইন্দিরা গান্ধীকে মোট তিনবার (১৫ আগস্ট, ১৯৭৫, ১০ নভেম্বর, ১৯৭৫ এবং ১৬ জুলাই, ১৯৭৬) চিঠি লিখেছেন নিজের ও সঙ্গীদের মুক্তির জন্য। চিঠিগুলিতে এবং সঙ্ঘের কাজকর্মে যেগুলি প্রকাশ পেয়েছিল—

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন জানান সঙ্ঘীদের মুক্তির শর্তে। স্বাধীনতা দিবসে ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণের প্রশংসা করা হয়। জরুরি অবস্থার সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচী সমর্থন করে আর এস এস প্রচার করে। যুব নেতা হিসাবে সঞ্জয় গান্ধীর উত্থানকে আর এস এস-এর হিন্দি পত্রিকা পাঞ্জজন্যে অভিনন্দন জানানো হয়। সরকার বিরোধী কোনো কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ না করার অঙ্গীকার করা হয়। একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে সংঘের একাংশ কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে ৩০ জন সঙ্ঘী ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখে জানান, তাঁরা মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে মুক্তি পেলে জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করবেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দিয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন না। ইন্দিরা গান্ধী বাজপেয়ীকে ক্ষমা করায় ২১ মাসের জরুরি অবস্থার বেশিরভাগ সময়ে তিনি প্যারোলে মুক্ত ছিলেন ('দি হিন্দু', ১৩.৬.২০০০)।

জরুরি অবস্থায় সরকার ও ইন্দিরা কংগ্রেসের দমননীতি ও সন্ত্রাসের ফলে জন অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভারতের জরুরি অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। প্রবীণতম কংগ্রেস নেতা জগজীবন রাম সহ বেশ কিছু নেতার দলত্যাগের পর রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধী ভেবেছিলেন যে বিরোধীরা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৭ ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙে দিতে বলেন। ষষ্ঠ লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হন। কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

জরুরি অবস্থার ৫০তম বর্ষে দেশে চলছে অঘোষিত জরুরি অবস্থা ঃ

ভারতে এখন জনসঙ্ঘের উত্তরসূরীরা ক্ষমতায় রয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার দেশে এক অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করেছে। আর এস এস-এর শতবর্ষে সংবিধানের বিভিন্ন ধারা পরিবর্তন করা হচ্ছে। বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে, কর্পোরেট মিডিয়াকে ব্যবহার করে, প্রতিবাদীদের দেশদ্রোহী দাগিয়ে দিয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। জেলে বন্দি করা হচ্ছে। এই ভাবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করা হয়েছে।

ভারতের গণতন্ত্র প্রসঙ্গে সুইডেনের 'ভি-ডেম ইনস্টিটিউট' তাদের রিপোর্টে বলেছে, "ভারতবর্ষ এক নির্বাচন ভিত্তিক স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়েছে।" 'ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' প্রকাশিত রিপোর্টে ভারতে 'ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আমেরিকার 'ফ্রিডম হাউস' তাদের প্রতিবেদনে ভারতকে মুক্ত গণতন্ত্রের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 'আংশিক মুক্ত' গণতন্ত্রের তালিকায় স্থান দিয়েছে। মোদি সরকারের সময়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করার যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ঃ

১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল ঃ বিলটি গত বাদল অধিবেশনে পেশ করা হয়েছে। এই বিলটি ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্রের উপর নজিরবিহীন আক্রমণ। এই বিলের মাধ্যমে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সাংবিধানিকভাবে প্রতিহিংসা চালানোর

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

প্রসঙ্গ ঃ ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাত

শাশ্বতী মজুমদার

সোশাল মিডিয়ার নিউজ ফিডে স্রোতের মতো ঢুকছে গাজা সম্পর্কিত পোস্ট। ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার, প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়ানোর, গাজার শিশুদের বাঁচানোর বার্তা দিচ্ছে। ৭৩৩ দিন ধরে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়া আগুন, মৃত্যু আর ক্ষুধার দিবারাত্রির ইতি টানছে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা। ১৩ অক্টোবর, ২০২৫। ইজরায়েলি সেনাবাহিনী চলে যেতে শুরু করেছে দক্ষিণ গাজা ছেড়ে। হামাসের পণবন্দী জীবিত ২০ জন ইজরায়েলিকে খান ইউনিসে প্রত্যার্পণ করা হচ্ছে রেড ক্রসের কাছে। ইজরায়েলের কারাগার থেকে প্যালেস্তিনীয় বন্দীরা একে একে মুক্ত হয়ে বাসে করে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের রামাল্লায় পৌঁছচ্ছেন। পথে পথে জনজোয়ার। কোথাও তারা অপেক্ষা করছে বিশ, পঁচিশ, তিরিশ বছর পরে মুক্তি পাওয়া বন্দীদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। গোটা গাজা তো এখন শরণার্থী শিবির! কোথাও জনবসতি নেই—শুধু বাড়িঘর, স্কুল, হাসপাতালের ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যেই শিশুরা, কিশোররা নাচছে, গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে খোলা আকাশের নীচে। মাথার ওপর ভোমরার মতো ড্রোনের উড়ে চলা আর মুহুর্মুহু ফুলঝুরির মতো বোমা ঝরে পড়ার দিনরাত যাদের সঙ্গী, যারা চোখের সামনে প্রতিনিয়ত দেখেছে খেলার সাথী, স্কুলের সহপাঠীর দেহ নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে, দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যাদের জীবনে জোর করে, যাদের জনগোষ্ঠী হিসেবেই চিরতরে মুছে ফেলার পণ করে বীভৎস গণহত্যা চালানো হয়েছে, তারা আজ অস্ত্র সংবরণকে উদযাপন করছে। এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণশক্তি এরা পেল কোথায়!

বছরখানেক আগে টিকটকের একটি রিলস্ ভাইরাল হয়েছিল—আহমেদ আবু আমশা নামে একজন সঙ্গীত শিক্ষক ড্রোনের গোঙানির সঙ্গে হার্মোনাইজ করে সম্মেলক গান গাওয়া এবং বাজনা বাজানো শিখিয়েছেন শিশুদের একটি দলকে যাদের নাম 'গাজার পাখিরা গাইছে'। ভয়, বিহ্বলতা জাগানো মৃত্যুদ্যুতের পদধ্বনিকে কীভাবে সুরে ছন্দে জীবনের জয়গানে মিলিয়ে নিয়েছে তারা! ঐ ভিডিয়ো দেখে আর বিস্ময়ের শেষ থাকে না। গানের কথা অনুবাদ করলে এরকম—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো হে উট চালক, আল্লার সুরক্ষা তোমাকে ঘিরে রাখবে, শহীদের রক্তে মিশে আছে এলাচের ঘ্রাণ, আকাশের তারারা কাঁদছে।

বিপন্নতার আরেক স্মৃতি ভেসে ওঠে—১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে নাৎসি বাহিনীর অধীনস্থ পোল্যান্ডের ওয়ারশতে ইহুদি ঘেটোতে এক অনাথ আশ্রমের ২০০ শিশু তাদের পালক পোলিশ-ইহুদি শিক্ষাবিদ জানুজ কোরজেকের সঙ্গে উঠছে ট্রেনে, সেই ট্রেন যাবে ট্রেবলিঙ্কা নির্মূলকরণ শিবিরে, কিন্তু সেই শিশুদের চোখমুখ ভয়হীন, শান্ত, আলোকময়। ট্রেবলিঙ্কায় যাবার জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ আসার পর জুলাই মাসে শিশুরা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় করেছিল কোরজেকের পরিচালনায়। অমলের মতো রাজার চিঠি পেয়েছিল হয়তো সেই মায়াবী আলোমাখা শিশুর দল!

স্মৃতিভারে বিমূঢ় হয়ে কারণ খুঁজতে থাকবো—যে ইহুদি জনগোষ্ঠীর দুই তৃতীয়াংশকে সেদিন সারা ইউরোপ থেকে নিকেশ করা হয়েছিলো, সেই ইহুদিদেরই নিজেদের রাষ্ট্রের মুখচ্ছবিতে পরবর্তীকালে আগ্রাসনের, হন্তারকের বিভীষিকাময় ফ্যাসিস্ট রূপ দেখা দিল কেন? রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের জনগণ যে এক নয় এই বাস্তব কথাটা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই, বিশেষত সেই রাষ্ট্র যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হয় এবং তার সঙ্গে আমাদের নিজের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শত্রুতা থাকে। আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার জায়নবাদীরা ইহুদিদের প্রতিনিধিত্ব করে না, যেমন ঐস্লামিক মৌলবাদীরা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না, আর 'হিন্দুত্ব'র ধ্বজাধারীরা হিন্দুদের প্রতিনিধি নয়।

সাধারণ মানুষের যুক্তিবুদ্ধি, অনুভূতি যে রাষ্ট্রনেতাদের কথা মতো চলে না তার অন্যতম উদাহরণ হলোকাস্টের থেকে বেঁচে ফেরা একজন হাঙ্গেরীয় ইহুদি বেন মিডলঅর্ডার। প্যালেস্টাইনের ওপর নেতানিয়াহুর আগ্রাসনের বিরোধিতা করে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন এবং বলেন যে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইজরায়েলের প্রতিনিধি যখন হলুদ তারকা চিহ্ন ধারণ করে উপস্থিত হন তখন তিনি হলোকাস্ট নিয়ে মানুষের স্মৃতির অপব্যবহার করেন। কারণ নাৎসিরা ইহুদিদের বাধ্য করতো ঐ চিহ্ন ধারণ করতে।

এইরকম চিহ্নায়ন মানুষের অন্ধ আবেগকে উসকে দেওয়ার জন্য করা হয়। যেমন, হলুদ তারা অতীত ইতিহাসের ক্ষতকে জাগিয়ে তোলে আজকের ইজরায়েলে উগ্র জাতীয়তাকে মান্যতা দিতে চায়। যেমন আমাদের এখানে প্রতিবেশী দেশে সামরিক অপারেশনের নামকরণে সিঁদুরকে জুড়ে দেওয়া হয়। জঙ্গিহানা বা সামরিক অভিযান কোনোটির সঙ্গেই সিঁদুরের যোগ নেই, কিন্তু প্রতীক হিসাবে তা এক ধর্মের মানুষের মনে যুদ্ধজিগির জাগাতে আর অন্য ধর্মের মানুষের মনে ভীতি জাগাতে সক্ষম।

নেতানিয়াহু প্যালেস্টাইনে গণহত্যার পক্ষে বৈধতা আদায়ের জন্য যখন হলোকাস্টের স্লোগান ''নেভার এগেইন'' ব্যবহার করেন তখন তা অপব্যবহার কারণ ভবিষ্যতে গণহত্যা বা ওই ধরনের হিংসা এবং ফ্যাসিজমকে প্রতিরোধে শপথ হিসেবে ঐ স্লোগান ব্যবহৃত হতো। দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষে বুচেনওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে মুক্তিপ্রাপ্তরা প্রথম এই স্লোগান ব্যবহার করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের মারিওন ইনগ্রাম, তিনিও হলোকাস্ট পেরিয়ে আসা মানুষ এবং শান্তির পক্ষে। অস্কারের মতোই তিনিও গাজায় ইজরায়েলি নৃশংসতার নিন্দা করে পথে নেমেছেন।

ইউরোপের নানা দেশেই এভাবে হলোকাস্ট সারভাইভার বৃদ্ধবৃদ্ধারা তরুণদের সঙ্গে পথে নেমে গাজার মানুষকে রক্ষার কথা বলেছেন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর প্যালেস্টাইনের জঙ্গীগোষ্ঠী হামাস গাজা-ইজরায়েলের মাঝের বিরাট উঁচু প্রাচীর অতিক্রম করে রকেট এবং প্যারাগ্লাইডার হামলা চালায়। দক্ষিণ ইজরায়েলে সামরিক এলাকায় এবং ২০টি পার্শ্ববর্তী বসতি অঞ্চলে প্রায় ১২০০ মানুষের মৃত্যু হয়, বহু মানুষ আহত হন, আড়াইশ'র ওপর অপহৃত হন। বলা হয়েছিল, ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষের পর এতো বড় আঘাত দেশের মাটিতে ইজরায়েলের ওপর হয়নি। অথচ ইজরায়েলের তো অন্যের ভূখণ্ডে আকাশপথে হামলা, বোমা বর্ষণ, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজা ভূখণ্ডে দখলদারি, হত্যা, গুম করা, তৃতীয় একটি দেশে গিয়ে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ এরকম অসংখ্য অপরাধমূলক কাজের রেকর্ড আছে। অনেক সময়ে হামলা করা হয়েছে বিনা প্ররোচনায়, অসামরিক এলাকায়। তবু হামাসের হামলাকে অজুহাত করেই ইজরায়েল গাজা যুদ্ধ শুরু করে। সে যুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধই নয়, একতরফা আক্রমণ, দখলদারি, উচ্ছেদ, খাদ্য ও ওষুধের সঙ্গে জল সরবরাহও বন্ধ করা, নির্বিচারে শিশুহত্যা, গণহত্যা। এই শতাব্দীর হলোকাস্ট।

ইজরায়েলি হয়েও প্যালেস্তাইনের সংগ্রামের শরিক হয়েছেন এরকম আরেক জন ছিলেন আর্না মের-খামিস। তিনি ছিলেন ইজরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। বিয়ে করেন আরেক পার্টি সদস্য সালিবা খামিসকে। সালিবা ছিলেন আরব খ্রিস্টান। ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে তাঁরা লড়াই করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকে উত্তর ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে জেনিন উদ্বাস্তু শিবিরে আর্না তৈরী করেন 'ফ্রিডম থিয়েটার'। সংগ্রামের সংস্কৃতি কীভাবে প্যালেস্টাইনে তৈরী হয়েছে তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ ফ্রিডম থিয়েটার। এই নাট্যদলের শিল্পীরা তাঁদের প্রযোজনা নিয়ে ২০১৫-১৬ সালে ভারতে এসেছিলেন প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের কথা তুলে ধরার জন্য। তিন মাস ধরে তাঁরা কলকাতা সহ ভারতের ১০টি শহরে ৩০টি শো করেছিলেন জন নাট্য মঞ্চের সহযোগিতায়। প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই আর শিল্প তাঁদের নাটকে পরস্পর হাত ধরে থাকে। ফ্রিডম থিয়েটারের বিষয়ে আর্নার এক ছেলে জুলিয়ানো মের-খামিস ১৯৮৯ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে একটি তথ্যচিত্র তৈরী করেন—'আর্নাস্ চিল্ড্রেন'। পৃথিবীর যে-কোনো শিশুদের মতো স্বাভাবিক প্যালেস্তিনীয় শিশুরা, শুধু পার্থক্য একটাই—জন্ম থেকে হানাদার বিমান, ট্যাঙ্ক, মিলিটারির উপস্থিতির মধ্যে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে শিখে যায় তারা। তার মধ্যেও তারা স্বপ্ন দেখে, গান গায়, নাটক করে, ছবি আঁকে, হানাদারের হাতে মারা যায়, কেউ কেউ হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। শান্তিবাদী জুলিয়ানো খুন হয়ে যান ২০১১ সালে। হামাসে জঙ্গির সরবরাহ কেন অব্যাহত থাকে আমরা কি ভেবে দেখেছি?

১২ অক্টোবর ২৮ বছরের সাংবাদিক সালেহ আল জাফারওয়াই খুন হয়ে গেলেন ইজরায়েলপন্থী হামাস বিরোধী মিলিশিয়ার এক সদস্যের হাতে, সংঘর্ষের খবর করতে গিয়ে। হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ঠিক পরের দিন। দু'বছর আগে একটি ভিডিয়োতে তিনি জানিয়েছিলেন নিজের দেশকে ছেড়ে যেতে তাঁর খারাপ লাগার কথা। জানুয়ারি মাসে আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সালেহ বলেছিলেন—আমি প্রত্যেক সেকেন্ড ভয়ে থাকি। বলেছিলেন, যেসব দৃশ্য দেখেছেন, যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছেন তা কোনোদিনও মোছা যাবে না স্মৃতি থেকে। ঝলমলে মুখে যুদ্ধবিরতির খবর করা তরুণ নিজেই স্মৃতি হয়ে গেলেন পরের দিনই। সেদিন তাঁর দাদা নাজি দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে ইজরায়েলের জেল থেকে ফিরেছেন।

কায়রোয় যে সমঝোতা পত্রে সই হয়েছে তার গ্যারান্টর হয়েছে মিশর, কাতার, তুরস্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে ইজরায়েলের সংসদ নেসেটে ট্রাম্প বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছেন পণবন্দীরা মুক্তি পাওয়ায়। নেতানিয়াহু ম্লান। এই কৃতিত্ব চেটেপুটে নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বীরের ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নোবেল পুরস্কার একটুর জন্য ফস্কে গেছে বলে ওয়াশিংটনের অসন্তোষ চাপা থাকেনি। কায়রোর শীর্ষ সম্মেলনে ২০টি দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব সাক্ষী থেকেছেন। ট্রাম্প তো ঘোষণা করেই দিয়েছেন—'যুদ্ধ শেষ'। যদিও সব পক্ষই জানে সত্যিই 'শেষ' কিনা বলার সময় এখন নয়। এখনই দরকার গাজায় খাদ্য এবং চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছনো। দরকার পুনর্নির্মাণ-পুনর্বাসন পরিকল্পনা। যার প্রাথমিক অনুমিত ব্যয় ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পুনর্নির্মাণে সময় লাগবে কয়েক দশক।

তবে প্রশ্ন কিন্তু থাকবেই এই সেদিন পর্যন্ত বৈশ্বিক উত্তরের রথী-মহারথীদের ভূমিকা নিয়ে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রাক্তন কর্মকর্তা অ্যান্ড্রু গিলমোর বলেছিলেন, ১৯৯৪ সালে রোয়ান্ডার গণহত্যার পর কোনো সেনাবাহিনীর হাতে এত মৃত্যুহার দেখা যায়নি। কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিকদের প্রতি নির্দেশ ছিল 'গণহত্যা', 'জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ', 'অধিকৃত অঞ্চল' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে চলার। এমনকি, এলন মাস্ক, যিনি সর্বদাই কথা বলার স্বাধীনতার কথা বলে থাকেন— এক্স হ্যান্ডেলে 'ডিকলোনাইজেশন', 'ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি' ইত্যাদি লেখা নিষিদ্ধ করেন। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের বিক্ষোভ বন্ধ করতে ক্যাম্পাসে পুলিশ পর্যন্ত ডেকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছে, সাসপেন্ড করা হয়েছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দমেনি। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যালেস্টাইন বিষয়ক এক সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্রীসের অর্থমন্ত্রী ইয়োনিস ভারুফাকিস ঐ সম্মেলনে অনলাইন বক্তা ছিলেন, তাঁর বক্তব্য বন্ধ করে দেওয়া হয়, উপরন্তু জার্মানিতে কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপ করতে পারবেন না, এরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তাঁর ওপর।

ইউনিসেফ যখন গাজার নিহত এবং আহত শিশুদের সংখ্যা ৫০০০০ ছাড়ানোর রিপোর্ট দিচ্ছে তখনই রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের রিপোর্ট—'দখলের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি' প্রকাশ করছে কীভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার একের পর এক কোম্পানি ইজরায়েলে যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধ বিমানের যন্ত্রাংশ, ভারী যন্ত্রপাতি, যুদ্ধে ব্যবহারের সফটওয়ার সরবরাহ করে অকল্পনীয় মুনাফা করছে তার বিবরণ। এই কর্পোরেটেরা এখনও নিরস্ত হয়নি।

কায়রো সম্মেলন কিছুটা স্বস্তি দিলেও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ শান্তি প্রক্রিয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে এটা সবথেকে বড় উদ্বেগের বিষয়। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২১তম রাজ্য সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার অঙ্গীকার

প্রণব কর

আগামী ১০-১২ জানুয়ারি, ২০২৬-এ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২১তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই গত ৬ মে, ২০২৫ তারিখে নদীয়া জেলা দপ্তরে প্রায় চারশত জন সদস্যের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে 'অভ্যর্থনা কমিটি'। ২০তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলায় ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে। ২০তম সম্মেলনের পূর্ববর্তী সময় থেকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক ও অন্যান্য দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে গণ-অবস্থান, কর্মবিরতি পালন, বিধানসভা অভিযান এবং তাকে কেন্দ্র করে ৪৭ জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার হওয়া কর্মচারীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে বিপুল কর্মচারী জমায়েত—এই ধরনের যেসব একাধিক জঙ্গী আন্দোলন তৈরী হয়েছিল তা তরঙ্গের শীর্ষে ওঠে ২০তম সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই ১০ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শুধুমাত্র কর্মচারী স্বার্থে চার দফা দাবিতে ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে। ১৯৬৮ সালের শুধুমাত্র কর্মচারীর দাবিদাওয়াকে নিয়ে ধর্মঘটের ৫৫ বছর পর এই ধর্মঘট কর্মচারী আন্দোলনের এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে।

ধর্মঘটের পরবর্তীতে ৪ মে, '২৩ যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে নবান্ন অভিযান হয় ঐ একই দাবিতে। মূলত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে এই জমায়েত হয়। কর্মচারী সমাগমে হাওড়া চত্বর প্লাবিত হয়ে যায়।

২০২৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত ২৩ দিন ধরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে কোচবিহারের সিতাই থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পর্যন্ত প্রায় ৩৬০০ কিলোমিটার ব্যাপী পথ অতিক্রম করে 'অধিকার যাত্রা' করা হয় মূলত রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার দাবিকে কেন্দ্র করে। সারা রাজ্য জুড়ে বিপুল সাড়া পড়ে এই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে। প্রশাসনের বাইরে অবস্থিত রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ বিপুলভাবে সমর্থন জানায় এই কর্মসূচীকে। এই কর্মসূচীর অব্যবহিত পরেই ১৪ মার্চ, ২০২৪ বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ সমস্ত মহার্ঘভাতা প্রদান, শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ সহ রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে নবান্ন অভিযান করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

এই সময়কালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি একাধিকবার জেলা, মহকুমা এবং ব্লক সফর করেছে। জেলা নেতৃত্বরা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলিও সফর করেছে। এই সফর কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বেশ কিছুটা ইতিবাচক ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে।

গত ২৪ জুন, ২০২৫ তারিখে সারা রাজ্য জুড়ে ৩ ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচী রূপায়িত হয় মূলত ৯ জুলাই-এর ধর্মঘটের সমর্থনে এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন রায়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতার অন্তত ২৫ শতাংশ সর্ব কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য অবিলম্বে লাগু করার দাবিতে। কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতা কর্পোরেশনের পাশে এই কর্মসূচী হয়েছে বিপুল কর্মচারী, পেনশনার্সদের উপস্থিতিতে। এই অবস্থান বিক্ষোভ থেকে ৪ জুলাই, '২৫ দু'ঘণ্টার 'পেন ডাউন' কর্মসূচীর ঘোষণা হয়। এই কর্মসূচী সারা রাজ্য জুড়ে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৯ জুলাই, ২০২৫ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা সর্বভারতীয় ধর্মঘটে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে সরকারী কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেছে।

রাজ্য সরকার গত ২৫ জুন হাইকোর্টের নির্দেশে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। তাতে দেখা যায় যে মহার্ঘভাতা প্রদানের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বদান্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে তার পরের দিনেই অর্থাৎ ২৬ জুন, ২০২৫ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সর্বত্র টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করে।

যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী এই সময়ের দাবি। সামগ্রিকভাবে কর্মচারী সমাজকে আবৃত করে রাজ্য প্রশাসনের কাছে কর্মচারীদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে হাজির করার লক্ষ্যে সব কর্মচারী মঞ্চের নেতৃত্বে গত ২৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখে 'নবান্ন চলো' কর্মসূচী করা হয়। সব ধরনের প্রশাসনিক হুমকিকে উপেক্ষা করে ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে এই অভিযানে।

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অন্যতম মূল আহ্বান ছিল অস্থায়ী বা চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের পৃথক সংগঠন তৈরী করা। সমকাজে সমবেতন, নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো তৈরী করা, চাকুরীর স্থায়ীকরণ, অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে অস্থায়ী কর্মচারীদের সংগঠিত করে তাদের পৃথক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এই কাজে সমিতিগুলিকেই প্রাথমিক ভূমিকা নিতে হবে। বেশ কিছু সমিতি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী বিন্যাসে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটছে। অস্থায়ী কর্মচারীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আগামী দিনে প্রশাসনের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে অস্থায়ী কর্মচারীদের যুক্ত করেই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের আরও বেশি করে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণে শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। ইতিমধ্যেই নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির আকণ্ঠ পাঁকে রাজ্য প্রশাসন ডুবে রয়েছে। শুধু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও ভয়ানক দুর্নীতি চলছে। ফলে প্রশাসনের অভ্যন্তরে স্থায়ী কর্মচারীর চূড়ান্ত ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একজন কর্মচারীকে ৩-৪ জন কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট কোনো অফিস-আওয়ার থাকছে না। শনি-রবিবারের ছুটি বলে কিছু থাকছে না। জেলা স্তরগুলিতে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দাবি তুলেছে স্বচ্ছভাবে স্থায়ীপদে নিয়োগ করতে হবে। এই দাবিকে সর্বস্তরের কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে আমলাতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক চরিত্র ভয়ানকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। শাসকদলের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে এই আমলাবাহিনী সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ছেন। অনেক ক্ষেত্রে শাসকদলের এক্সটেনশন হিসেবে এরা কাজ করছেন। প্রশাসনের অভ্যন্তরে হুমকি সংস্কৃতি ও নীতিহীন বদলি নীতি চালু করতে সরকার-মুখাপেক্ষী ইউনিয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ছেন। এরা কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছেন। কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিতে ডেপুটেশন নিচ্ছেন না, বা নিলেও এমন স্তরের আধিকারিকদের কাছে পাঠাচ্ছেন যাঁদের এ ব্যাপারে কোনো কার্যকরী ভূমিকা থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রে অভব্য আচরণ করছেন এরা। এরকম ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে কর্মসূচী নিতে হবে এর প্রতিবাদে।

পাশাপাশি কর্মচারী মননকে সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনায় আক্রান্ত করতে মেরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রশাসনের অভ্যন্তরে। বাইরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যেভাবে বামপন্থী আন্দোলনকে মিডিয়া অবরুদ্ধ করে দিয়ে শুধু রাজ্যের শাসকদল ও কেন্দ্রের শাসক দলের বাইনারী তৈরী করতে ব্যস্ত, অনুরূপভাবে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলন, অভিযান, লড়াই, আত্মত্যাগকে অস্বীকার করে রাজ্যের ও কেন্দ্রের শাসকদলের লড়াই হিসেবে পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে মিডিয়া সদা ব্যস্ত। কর্মচারী আন্দোলনে নতুন নতুন নেতৃত্ব আবিষ্কার করা এবং তাদের প্রোমোট করতে ব্যস্ত রয়েছে অনেকে। কোথাও কোথাও কর্মচারীরা এতে যে বিভ্রান্ত হচ্ছেন না, তা বলা যাবে না। কর্মচারী আন্দোলনের অভ্যন্তরে এই মেকি বাইনারী তৈরীর প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে, একে প্রতিহত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনকে দৃশ্যমান করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা, তাকে নিয়ে অফিসে অফিসে কর্মচারীদের কাছে পৌঁছোতে হবে আমাদের।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে আমাদের। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এক বিপুল সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। তার প্রসার ঘটাতে হবে কর্মচারী মননে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এই মধ্যবিত্ত সমাজের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। এই প্রবণতাকে হাতিয়ার করে ডিবেট, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, ক্যুইজ, গান, সিনেমা, নাটক, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করতে হবে। এবছর সুকান্ত ভট্টাচার্য ও ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ চলছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এঁদের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে আমরা কর্মচারী পরিসরে আমাদের উপস্থিতিকে বৃদ্ধি করতে পারব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় বিকল্প পাঠশালা গড়ে তোলা হচ্ছে, যার মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিপ্রতীপে সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কর্মচারী সমাজ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টাকে আরও বড় আকারে নিয়ে যেতে হবে।

মহার্ঘভাতাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার যে কুনাট্য অনুষ্ঠিত করে চলেছে তার সরাসরি অভিঘাত আমাদের উপর এসে পড়ছে। যারা ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে মহার্ঘভাতা নিয়ে স্থায়ী আদেশনামা তৈরী করবে এবং মহার্ঘভাতা সর্বদা আপ-টু-ডেট থাকবে, তারা আদেশনামা জারি করে মহার্ঘভাতা তুলে দিয়েছে। মহার্ঘভাতাকে দয়ার দানে পরিণত করেছে। মহার্ঘভাতা যে কর্মচারীদের অধিকার এটাই প্রায় ভুলিয়ে দিতে চলেছে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তার আগে আগামী ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে জেলাস্তরের সব সম্মেলন সমাপ্ত করতে হবে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জুলাই-আগস্ট, ২০২৫ মাসের বেতন থেকে নির্দিষ্ট হারে তহবিল সংগ্রহের কাজ চলছে। এই তহবিল সংগ্রহকে সম্মেলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরেই আমাদের দ্রুত তহবিল সংগ্রহ করতে হবে।

আগামী একবিংশতিতম সম্মেলনে প্রবেশের পূর্বে আমাদের সমস্ত ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনের মধ্য দিয়েই আমরা সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলব এই অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করছি। □

সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি কথার কথা নয়

মানস কুমার বড়ুয়া

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আর এস এস-এর হিন্দুত্বের ধারণার সাথে হিন্দুধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, ভারতের সংবিধানের যে মৌলিক কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্র এর সাথে আর এস এস-এর হিন্দুত্বের ধারণার বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ভারতীয় ধারণা নিয়ে আর এস এস বরাবর বিতর্ক সৃষ্টি করে এসেছে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বয়ংসেবক লালকৃষ্ণ আদবানি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ভণ্ড আখ্যা দিয়েছিলেন। ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ আদবানির পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরেকজন বিশ্বস্ত স্বয়ং সেবক তথা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং লোকসভায় বলেছিলেন, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে অপব্যবহৃত শব্দ, এটা বন্ধ হওয়া উচিত’। তিনি আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন যে, সেকুলারিজম শব্দের আক্ষরিক অর্থ হিসাবে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের স্থলে ‘পন্থ নিরপেক্স’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। তিনি আরও বলেন, ‘সেকুলারিজম শব্দটির রাজনৈতিক অপব্যবহার দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। আরও একধাপ এগিয়ে সম্প্রতি আর এস এস-এর এক নেতা দাবি করেছেন যে সংবিধানের মুখবন্ধ থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি সরিয়ে দেওয়া হোক। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে ব্যবহার করে সংঘ পরিবার মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তারা একটা মিথ্যা প্রচারের হাওয়ায় মানুষকে ভাসিয়ে দিতে এই বক্তব্য তুলে ধরে যে, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সমর্থকরা সবাই নাস্তিক এবং হিন্দু ধর্মবিরোধী, সুতরাং তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের কাছে একটা হুমকি।

আর এস এস সবসময়ই ধর্মনিরপেক্ষদের ধর্মবিশ্বাসী মানুষের শত্রু হিসাবে দেখায়। তারা সুকৌশলে আড়াল করতে চায় যে তাদের হিন্দুত্ববাদের সাথে হিন্দু ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। হিন্দুত্ববাদের আর এস এস ব্র্যান্ডের সাথে প্রকৃত হিন্দুধর্মের প্রচুর ইতিবাচক দিক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আর এস এস-এর হিন্দুত্ব মূলত ইসলাম ও খ্রীস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে একটি ধারণা প্রচার করে অবিশ্বাসের একটা বাতাবরণ তৈরী করে মানুষকে একজোট করার একটা কৌশল। এই প্রচারকে ব্যবহার করে তাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠা। ধর্মনিরপেক্ষতা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আর এস এস-এর এই মিথ্যা প্রচারের জবাব হিসাবে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা খোঁজা প্রয়োজন।

এর জন্য আমাদের ইতিহাসে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ বা ধারণাকে তার বিপরীত মেরুর পক্ষধারীরা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে বরাবর গুলিয়ে দিতে চেয়েছে। পশ্চিমী ধারণা অনুযায়ী ‘সেকুলারিজম’ বা ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রকে চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এর পিছনে যুক্তি হল ধর্মীয় বিশ্বাস বা জাতিগত পরিচয় নিরপেক্ষভাবে সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে দায়িত্ব পালন করাটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু চার্চ একটি নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসী এবং সেই ধর্মের অনুশীলনকারী মানুষজনের সাথে সম্পর্কিত। ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও চার্চের এই বিদ্বেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আধুনিক ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রে এই নতুন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং যুদ্ধে জয়ী হবার পর ‘সেকুলার’ রাষ্ট্রব্যবস্থা সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব এবং তার ফলে শক্তিশালী শ্রমিক শ্রেণীর ও তাদের আন্দোলনের জন্ম এবং ১৯১৭-তে রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সহজাত প্রগতিশীল ভূমিকাতে প্রতিষ্ঠিত হল ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র’ বা এমন রাষ্ট্র যার নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ধর্ম, যাজককুল এবং চার্চগুলির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় সমাজও ধর্মনিরপেক্ষ বা ‘সেকুলার’ সমাজে পরিণত হল। ফলে চার্চ বা যাজককুলের নাগরিকদের উপর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেল এবং প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, যেখানে আইনের শাসনই রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক ভিত্তি হয়ে উঠল। উপরোক্ত ব্যাখ্যার মর্মার্থ হল ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য নির্মিত হয়েছে ঐতিহাসিকভবে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গে চার্চ বা ধর্মীয় উপাসনাস্থল ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের মতবাদ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। কারণ ভারতের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ইউরোপের থেকে ভিন্ন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পশ্চিমী আধুনিকতার কিছু স্বনিযুক্ত সমালোচকরা ‘সেকুলারিজম’ ধারণাটি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং এটা ভারতীয় কোনো মতবাদ নয় বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়।

ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় ধারণা নয় কারণ ভারতে একটা শক্তিশালী চার্চ সমগ্র সমাজের ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য কখনও ছিল না। কিছু তথাকথিত পণ্ডিতের এই বক্তব্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই মিথ্যা। কারণ ভারতে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সওয়ালকারীগণ লড়াই করছেন হিন্দুত্ববাদী মুভমেন্টের বিরুদ্ধে, তাঁরাই বলছেন, ভারতের বিশেষত্ব তার বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত এবং ধর্মীয় সমসত্বকরণের কোনো ধরনের নির্মাণ ভারতীয় সভ্যতার মর্মবস্তুর বিরোধী। সুতরাং ভারতীয় সমাজের এই অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য ও বহুত্বেরও ধারা দাবি করে যে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে। এই রাষ্ট্রে সমস্ত ধর্মের সমধরনের সম্মান ও স্বাধীনতা থাকবে এবং রাষ্ট্র সমস্ত সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে সম্মান জানাবে।

এর বিপ্রতীপে ১৯৪৩ সালে আর এস এস-এর ‘তাত্ত্বিক’ নেতা এম এস গোলওয়ালকর-এর পর্যবেক্ষণ হল, ভারতের অর্থ ‘একটি পতাকা, একজন নেতা এবং একটাই হিন্দুত্বের আদর্শ’। এই মতাদর্শই আর এস এস বহন করে চলেছে। আর এস এস-এর বর্তমান প্রধান মোহন ভাগবত বারবার উল্লেখ করেছেন যে, ভারত একটি হিন্দু দেশ এবং সাভারকর বলেছিলেন যে, যাঁদের উপাসনাস্থল বিদেশে তাঁরা নাকি ভারত মাতার সন্তান নয়। হেডগেওয়ার ও তার সহকর্মী মুঞ্জে উভয়ে মিলেই হিন্দুরা যাতে মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তার প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৯২৫ সালে আর এস এস প্রতিষ্ঠা করেন। আর এস এস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুঞ্জে হিন্দু যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৯৩৭ সালে নাসিকে ভোসলে মিলিটারি স্কুল স্থাপন করেছিলেন, যার নাগপুরে একটা শাখা ছিল। মুঞ্জে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুসোলিনী শাসনাধীন ইতালিতে যান ১৯৩০ সালে। গান্ধীজীর অহিংসা, ধর্মরনিপেক্ষতার মতবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন মুঞ্জে। সুতরাং আর এস এস-এর কর্মীরা হিন্দুদের রক্ষাকারী হিসাবে মুসলিমদের উপর যে আক্রমণ করে তা বিনা কারণে নয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বকারী আর এস এস দলিত বা নীচুজাতের মানুষের উপরেও আক্রমণ করে।

ভারত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। আর এস এস ও সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের শুধু নয়, হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি, তার বহুত্ববাদ এবং সর্বোপরি ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য ও বহুত্বকে আক্রমণ করছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতের বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করতে হবে। সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’-র উল্লেখ থাকাটা শুধু একটি শব্দের প্রয়োজন হিসাবে নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সমাজে ঐতিহাসিক ভাবেই আছে। আমাদের কাজ একে রক্ষা করা। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

জরুরি অবস্থার ৫০ বছর

পথ খুলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র গ্রেপ্তারের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা যে কোনো মন্ত্রীকে অপসারণের ব্যবস্থাই জরুরি অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা।

অভিবাসন ও বিদেশী নাগরিক সংশোধনী আইন ঃ এই আইনে বলা হয়েছে কোনো অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাকে নিজেদের দেশে ফেরত না পাঠানো পর্যন্ত ‘ডিটেনশন ক্যাম্পে’ আটক রাখতে পারবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। সেই কারণে রাজ্যগুলিকে ডিটেনশন ক্যাম্প করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এই আইনের মাধ্যমে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলাভাষীদের অনুপ্রবেশকারী বলে পুশব্যাক করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) ঃ এস.আই.আর. গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক অধিকারের উপর আঘাত। রাজনৈতিক দলগুলির সাথে পূর্ব আলোচনা ছাড়াই নতুন ভোটার তালিকা তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মূলত যে রাজ্যগুলিতে আগামীদিনে বিধানসভা নির্বাচন হবে সেখানেই এস.আই.আর. করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিহারে এস.আই.আর. হয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গে শুরু হবে। এস.আই.আর.-এর মাধ্যমে ভোটারদের উপর নাগরিকত্ব প্রমাণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে—যা সংবিধান (৩২৬ অনুচ্ছেদ) ও স্বাধীন ভারতের নির্বাচনী ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

UAPA আইন (The Unlawful Activities [Prevention] Act.), রাষ্ট্রদোহ আইন (Sedition Act.) সহ বিভিন্ন দানবীয় আইনগুলি সরকার বিরোধীদের চুপ করিয়ে রাখার জন্য প্রয়োগ করছে মোদি সরকার। পাশাপাশি আয়কর আইন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা আইন প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন স্তব্ধ করছে। FCRA (Foreign Contribution Regulation Act.) আইন প্রয়োগ করা হয়েছে সরকার বিরোধী কেউ যাতে বিদেশী আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে না পারে। বিরোধী দলের নেতাদের জব্দ করার জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির (E.D., CBI, I.Tax দপ্তর) নির্লজ্জ ব্যবহার করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করা, জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন প্রণয়ন করে রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা, সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো এবং মুসলিম পরিবারগুলোর বাড়ি বুলডোজারে (বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে) গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এস এস প্রধান বলেছেন, মুসলিমরা নির্দিষ্ট মসজিদগুলো ছেড়ে দিক, হিন্দুরা তিন সন্তানের জন্ম দিক প্রভৃতি ঘৃণা ভাষণের বন্যা চলছে দেশে। অন্যদিকে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে মোদি সরকারের সময়ে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ৫০ বছর আগের জরুরি অবস্থার থেকেও ভয়ঙ্কর—এক অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে দেশে। আজ আর এস এস-বিজেপি কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক জোটকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। □

উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

বিগত ৪ অক্টোবর, ’২৫ মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘরবাড়ি হারিয়ে বিপর্যস্ত সর্বস্বান্ত হয়েছেন সেখানকার মানুষ। জীবনহানির ঘটনাও ঘটেছে। সব হারানো মানুষের পাশে যথাসাধ্য সাহায্য নিয়ে তার চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী হাজির হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটার পরপরই সংগঠনের পক্ষ থেকে তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানানো হলে ব্যাপক সাড়া দেন সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার পরিজন। দরাজ হস্তে এগিয়ে এসেছে অন্তর্ভুক্ত সবক’টি সমিতি।

শুধু তাই নয় ত্রাণ নিয়ে আক্রান্ত জেলাগুলির বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় হাজির হয়েছে সংগঠনের কর্মী-নেতৃত্ব। দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং মহকুমার একাধিক জায়গায় ত্রাণ বণ্টনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্মসম্পাদক দেবব্রত রায়, সহ-সভাপতি রবীন্দ্র নাথ সিংহ রায়, জেলা সম্পাদক অরিন্দম মিত্র সহ জেলার নেতা-কর্মীবৃন্দ। কোচবিহার জেলায় ত্রাণ বণ্টনে সামিল ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মানস দাস, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাবলু ঘোষ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আশীষ মিত্র, জেলা সম্পাদক ধীরাজ রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। □

ত্রাণবণ্টন দার্জিলিংয়ে

ত্রাণবণ্টন কোচবিহারে

ভর্তি সঙ্কট থেকে পড়ুয়াদের রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পথ

দেবাশীষ রায়

শিল্পের আকালে বাড়তি লাভের আশায় যখন পরিযায়ী মানুষেরা রাজ্য ছেড়ে যাচ্ছে, তখন একই ছবি ফুটে উঠেছে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পড়ুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে। ফলে শিল্পের খরার বাজারে এবং দুর্মূল্যের কাজের বাজারে যখন প্রতিকূলতা বাড়ছে, তখন আরও কঠিন হয়ে চলেছে প্রতিযোগিতা। সরকারী বনাম বেসরকারী কলেজের পেশাদারিত্বের প্রতিযোগিতা, চাকরির প্রতিযোগিতা, আন্তঃরাজ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এমন কঠিন প্রতিযোগিতার আবহে এ রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকার ফলপ্রকাশ ও ভর্তিতে এবারের বেনজির বিলম্ব এই রাজ্যের পড়ুয়াদের এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্কটকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলেছে। ইতিমধ্যে বিলম্বিত রাজ্যের স্নাতক স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে। এই বিলম্বের সম্ভাব্য কারণ হল ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে সরকারী নির্দেশনামা আদালতের আদেশে বাতিল হওয়া। সন্দেহ নেই যে, কোনও ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন আদালতের এমন আদেশ পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। জটিল করে তোলে সংরক্ষণের সম্ভাব্য সুবিধাভোগী পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু এমন জটিলতার সূত্রপাত গত বছর যখন উচ্চ আদালত পদ্ধতিগত ত্রুটি উল্লেখ করে সংরক্ষণের তালিকা বাতিল করেছিল। ফলে সরকারের হাতে যে পরিমাণ সুযোগ ও সময় ছিল এবারের শিক্ষাবর্ষের আগে, সেই তালিকা যথাযথভাবে সংশোধনের সেটিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। ফলে এবারের শিক্ষাবর্ষে গোটা ভর্তি প্রক্রিয়াটাই পড়েছে অনিশ্চয়তার আবর্তে।

কিন্তু এমন অনিশ্চয়তার আবর্তে পড়েও যখন আদালতের নির্দেশে বাধ্য হয়েই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় অনলাইন ব্যবস্থায় রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ভর্তি শুরু করে দিয়েছে তখন কেন্দ্রীয়ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি কেন শুরু হচ্ছে না তা বোঝা যাচ্ছিল না। এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রবেশিকা পরীক্ষা রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স বহুকাল আগে নেওয়া হলেও দীর্ঘ ১১৭ দিন পর ওবিসি মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের পর ফল প্রকাশিত হয়েছে। যদিও ফল প্রকাশের এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে উদ্বিগ্ন ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ নিয়ে দ্রুত ফল প্রকাশ ও ভর্তির দাবিতে বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠন (এস.এফ.আই. ও ডি.ওয়াই.এফ.আই.) লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করেছে। সর্বশেষ ১৯ আগস্ট কলেজে ভর্তি ও ক্লাস কবে চালু হবে সে কথা জানতে বিকাশ ভবনে শিক্ষা দপ্তর অভিযান করতে গেলে এস.এফ.আই.-এর নেতৃত্বে মিছিলে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাঠি চালায়, লাথি মারতেও দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে। পরবর্তীতে অভিযানরত ছাত্র-ছাত্রীদের মারতে মারতে আটক করে বিভিন্ন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ফলাফল প্রকাশে এই অপ্রত্যাশিত বিলম্ব এবং অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উচ্চ ও মধ্যমেধার পড়ুয়াদের সিংহ ভাগ চলে যাচ্ছে ভিন্ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। ফলে রাজ্য জয়েন্টের সম্ভাব্য সফল উচ্চ মেধার মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত পরিবারের পড়ুয়ারা যাদের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত তারা পড়েছে বিপদের মধ্যে। মোটা মাইনের বেসরকারী কলেজে তারা না পারছে ভর্তি হতে, না সরকারী কলেজে ভর্তি হতে পারছে। অগত্যা এদের একটা বড় অংশ সাধারণ স্নাতক কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের সফল পড়ুয়ারা চলে গেলে তখন স্বাভাবিকভাবেই স্নাতক স্তরের বহু আসন খালি হয়ে যাবে। গত বছর রাজ্যে স্নাতক স্তরে মোট পাঁচ লক্ষ আসন খালি ছিল যা মোট আসনের অর্ধেকের বেশি। আর এ বছর অর্থাৎ ২০২৫-এ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা পড়ুয়াদের সংখ্যা ৪,৩০,০০০—যেটা ২০২৪-এর নিরিখে প্রায় দু'লক্ষ কম।

অপরদিকে কোনও কারণ না দেখিয়েই ১৯ আগস্ট হঠাৎ করেই মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিতের নির্দেশ জারি করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু কতদিনের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে তা বিজ্ঞপ্তিতে জানায়নি। তবে দপ্তর সূত্রে খবর আইনি জটিলতাই এর কারণ। এক্ষেত্রে মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তিযোগ্য উত্তীর্ণদের সমস্যা হচ্ছে, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ১ সেপ্টেম্বরের আগে মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ না হলে সেই ভর্তিকে মান্যতা দেওয়া হয় না। ফলে কয়েক হাজার নিট-উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী এবং প্রায় ১১ হাজারের বেশি ডাক্তারি পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে। অবিলম্বে কাউন্সেলিং চালু করার দাবি জানিয়েছে চিকিৎসক সংগঠনগুলি। ২০ আগস্ট রাজ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে পাঠানো এক চিঠিতে অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স ওয়েস্ট বেঙ্গল (এএইচএসডি)'র তরফে দ্রুত কাউন্সেলিং চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামও ১২ আগস্ট সরকারের এই দিশাহীন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে সরব হয়েছে এবং অবিলম্বে কাউন্সেলিং-এর জন্য সরকারকে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছে। রাজ্য সরকার দ্রুত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নিট-ইউজি পাশ করা কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী তাদের বছর নষ্টের আশঙ্কা করছেন।

প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে দিল্লীতে সমগ্র শিক্ষা মিশনে রাজ্যগুলিকে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে একটি করে বৈঠক হয়। বৈঠকের পোশাকি নাম প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ্যাল বোর্ড মিটিং (কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক, প্যাব)। এই বছরে এই প্যাব মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে হাজির ছিলেন রাজ্য সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিরেক্টর শুভ্র চক্রবর্তী, এসসিআরটি'র ডিরেক্টর ছন্দা রায় এবং স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিব বিনোদ কুমার। এই বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সম্মতিতে যে তথ্যগুলি উঠে এসেছে তা হল—(১) পশ্চিমবঙ্গের ৬৬,৭৪৪টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৫,১৪৯টিতে ১ জন করে শিক্ষক। (২) ৬,৪২৬টি আপার প্রাইমারি স্কুলের ৮৯১টিতে ১ জন করে শিক্ষক। (৩) প্রাথমিকে ১১,৫১৫টি স্কুলে পড়ুয়া ৩০-এর কম। (৪) ৩,৬৬৯টি প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া ১৫ জনের কম। (৫) ৭৪৭টি প্রাথমিক স্কুলে ১ জনও পড়ুয়া নেই। (৬) আপার প্রাইমারিতে ১,৪৭৫টি স্কুলে পড়ুয়া ৩০ জনের কম। (৭) ৭২০টি স্কুলে ১৫ জনের কম পড়ুয়া। (৮) ২৫৯টি স্কুলে ১ জনও পড়ুয়া নেই। (৯) স্কুলছুটের হার ৮.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৭.৮ শতাংশ। (১০) সমগ্র শিক্ষা মিশনে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের সিংহভাগ দেওয়ার পরেও এ রাজ্যে মাত্র ৬৪ শতাংশ স্কুলে খেলার মাঠ তৈরী হয়েছে, ইন্টারনেট সংযোগ হয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ স্কুলে, স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশ স্কুলে, বাউন্ডারি ওয়াল তৈরী হয়েছে মাত্র ৪৬ শতাংশ স্কুলে, সোলার প্যানেল বসেছে মাত্র ৪.৬ শতাংশ স্কুলে, বেশিরভাগ স্কুলে শৌচাগার এতটাই অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন যে সেগুলি ব্যবহারের অযোগ্য।

রাজ্যের বিধানসভার শিক্ষা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি (নেতৃত্বে শ্যামপুরের তৃণমূল বিধায়ক কালিপদ মণ্ডল) বিধানসভায় ২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালের জন্য যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তা এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক। (১) গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে যথেষ্ট শিক্ষক/শিক্ষিকার অভাব রয়েছে। বিশেষত নিউ সেট আপ বিদ্যালয়গুলিতে শূন্যপদ পূরণে বিভাগকে সচেষ্ট হতে হবে। (২) জেলায় অনেক প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নেই, ফলে স্কুলের প্রশাসনিক কাজ ও পঠন-পাঠনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। (৩) রাজ্যের অনেক স্কুলে ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। উক্ত ক্রমহ্রাসমানতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। (৪) ২০১০-১১ অর্থবর্ষে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে (শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের ধরে) শিক্ষক ছিলেন ৪,১৪,৪৭৪ জন। এখন এই ক্ষেত্রে শিক্ষক আছেন ২,৭২,৪৪৩ জন। এসএসকে, এমএসকে-গুলির ৭৫,০০০ শিক্ষক ধরলে শিক্ষক সংখ্যা ৩,৭২,৪৪৩। ২০১০-১১ অর্থবর্ষের তুলনায় শূন্যপদ ৬৯,০০০। এই রিপোর্ট কোনও বিরোধী বিধায়কের নয়, শাসকদলের বিধায়কের নেতৃত্বাধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির।

২০২২ সালে ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মণের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু যে তথ্য বিধানসভায় দিয়েছিলেন তাতে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নরূপ। মাদ্রাসা শিক্ষক ১০০০০, প্রাথমিক শিক্ষক ১৯০০৮৫, মাধ্যমিক শিক্ষক ১৩৯২৯৫, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক ২৩৭১১, প্রধান শিক্ষক ৫৮২৪ এবং শিক্ষাকর্মীদের শূন্যপদ যথাক্রমে ২৯২৩৫। অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বমোট শূন্যপদের সংখ্যা ৩,৯৮,১৫০।

উচ্চমাধ্যমিক পরবর্তী স্তরে অনুমোদিত পদের কমবেশি ৬০ শতাংশ পদ শূন্য। এই বিপুল সংখ্যায় শূন্যপদ গোটা সরকারী শিক্ষা পরিকাঠামোয় পঠন-পাঠন কার্যত অসম্ভব করে তুলেছে। ২০০৮ সালে এই রাজ্যে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ছিল ১:৩৫, শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে প্রয়োজন ১:৩০, বর্তমানে তা ১:৭৩। 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' হিসাবে পূর্বতন সরকারগুলি ৩৯টি সম্পূর্ণ সরকারী (সরকার পোষিত নয়) বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। এই ৩৯টি স্কুলে শিক্ষকদের অনুমোদিত পদ ১৮০০, কর্মরত শিক্ষক ৯০০ এবং শূন্যপদ ৯০০। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন প্রাথমিক শিক্ষা হোক বা উচ্চ শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের সরকারে থাকা শাসকের এই হেলাফেলা করা আসলে হয়তো পরিকল্পিত। বেসরকারী শিক্ষাকে সিলমোহর দিয়ে সরকারী অবৈতনিক শিক্ষা তুলে দেওয়াটা অ্যাজেন্ডা। এর পাশাপাশি শিক্ষা থেকে অনীহা তৈরী করা এক পরিস্থিতি রূপ নেবে যার জন্য অনেকেই আর উচ্চশিক্ষার পরিসরে যেতে চাইবে না। বিগত বেশ কিছু বছরের কলেজের ভর্তির তথ্য বলছে এই রাজ্যের নামে সরকারী ডিগ্রি কলেজগুলোর সিট ফাঁকা থেকেছে। যে কলেজগুলোতে প্রায় ৮-১০ বছর আগেও ফর্ম তোলার জন্য বিরাট প্রতিযোগিতা চলতো, ভর্তির পরীক্ষা দিত লক্ষের কাছাকাছি ছাত্র-ছাত্রীরা, সেই কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়েও সিট ফাঁকা থেকেছে। অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে এভাবে পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামীতে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ আরও কমবে। স্কলারশিপের টাকা বন্ধ মাস ধরে, গরিব ঘরের বা অন্যান্য মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। গ্রাম বা শহর বলে নয়, রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার থেকে ঠুনকো এক পণ্যে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্যের সরকার। ধীরে ধীরে লেখাপড়া তুলে দেওয়ায় এক ভয়ানক ব্লুপ্রিন্ট। যারা এরপরেও পড়ার জন্য আগ্রহী তাদের এবার ভরসার জায়গা হবে কেবলই বেসরকারী শিক্ষা। এই বেসরকারী কলেজের রমরমা হলে কী ভয়ানক পরিণতি হতে পারে তার কিছু নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। রাজ্যে বি.এড., ডি.এল.এড. ডিগ্রি ছাড়া সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে পড়ানোর সম্ভাবনা নেই বর্তমানে, সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে তো হবেই না। বেসরকারী হলে দু-এক জায়গায় ওই সংশ্লিষ্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষ আপনাকে এই ডিগ্রিতে ভর্তি হতে বলবে। এই ডিগ্রিগুলো বেশ কিছু বছর আগেও সরকারী কলেজে করানো হত। এদিকে এখন ব্যাঙের ছাতার মতো রমরমিয়ে তৈরী হয়েছে এই বি.এড., ডি.এল.এড. ডিগ্রির কলেজ। একদিকে সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের চাকরি সংশয়ের মুখে, কারণ চাকরি বিক্রির নামে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে কলেজে ভর্তিতেও চলছে অযথা বিলম্ব। শিক্ষার ওপর এই পরিকল্পিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদী সমাজের থেকে এক আনুগত্যের সমাজ তৈরীর চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রের এবং রাজ্যের শাসকদল। মূল পরিকল্পনা যৌবনের-আঠারোর আওয়াজকে দমিয়ে দেওয়া। বেশ কিছু বছর ধরেই এই আক্রমণের তীব্রতা বেড়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে রাজ্যের যে শিক্ষানীতি দুই মিলেমিশে ছাত্রসমাজের লেখাপড়ার অভিমুখকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শিক্ষার ওপর এই আক্রমণকে প্রতিহত করার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে এই নিয়ে তীব্র আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী করা। এই সমস্যার জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জীবন বিপন্ন, পাশাপাশি তাদের পরিবারের লোকদের অবস্থাও ভালো নয়। প্রবল মানসিক চাপের মধ্যে থাকা এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের পরিবারকে এর থেকে মুক্তি দিতে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে গোটা বাংলার সমস্ত শিক্ষানুরাগী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ই একমাত্র পথ। □

দেশজুড়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষার ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

গত কয়েক মাস ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে, যেভাবে বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে তা এক গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত। বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে অবহেলা, অপমান এবং কার্যত অস্বীকার করার প্রবণতা কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির তরফ থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক বিজেপি এই ধারণা চাপিয়ে দিতে চায় যে, বাংলাদেশী মুসলিমরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা আমাদের দেশের ভাষা হতে পারে না। তাই তারা বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশী ভাষা হিসাবে দাগিয়ে দিতে চাইছে। একইভাবে তাদের মতে উর্দু হলো মুসলিমদের ভাষা এবং সেই ভাষা ভারতের ভাষা হতে পারে না। ইতিহাসকে যারা বিকৃত করে, বিজ্ঞান ও যুক্তিকে যারা দূরে সরিয়ে দেয়, সেই অন্ধভক্তদের পক্ষে এই হাস্যকর যুক্তিকে খাড়া করা অস্বাভাবিক নয়। জ্ঞানের আলো থেকে শত যোজন দূরে থাকা অন্ধভক্তদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যে ভাষার কোনও ধর্ম হয় না, কোনও দেশও হয় না।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানার অভাবে অধিকাংশ মানুষের কাজ নেই। রাজ্যের তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতায় আসার পর নতুন কল-কারখানা খোলা তো দূরের কথা, বহু চালু কল-কারখানাও রাজ্য থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়েছে। এন রেগার একশো দিনের কাজও রাজ্য সরকার হিসেব দিতে না পারায় কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। আদালত একশো দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেও এখনও পর্যন্ত সে কাজ শুরু হয়নি। তাই কাজের সন্ধানে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গেও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ বসবাস করেন। অথচ এরাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে গিয়ে বাংলা ভাষা বললেই নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। বিশেষ করে, দেশের যে সমস্ত রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার আছে, সেখানে যে সকল বাঙালি কাজের সন্ধানে গেছেন, তাঁদের মুখের ভাষা বাংলা হলেই বাংলাদেশী তকমা লাগিয়ে বিতাড়ন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অনেককে পুশব্যাক করে বাংলাদেশেও পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও তাঁদের অধিকাংশের কাছেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা অন্যান্য নথি আছে। এইভাবে গোটা দেশে বাঙালি বিদ্বেষ উসকে দিচ্ছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। গত শতাব্দীর আটের দশকে ঠিক এইভাবেই আসাম থেকে বাঙালি বিতাড়ন শুরু হয়েছিল এবং এখনও তা চলছে। ২০২৪ সাল থেকে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি বিতাড়নের ছবি স্পষ্ট। বর্তমানে ওড়িশাতেও চলছে বাঙালি বিতাড়ন। এমন এক ভয়াবহ আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে যে বাংলায় কথা বলছে খবর পেলেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের নামে আটক করছে। কখনো থানার লক আপে, কখনো অস্থায়ী ক্যাম্পে, কখনো ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে নানাভাবে নির্যাতন, অপমান, হেনস্তা করছে। গোপনে আটকদের একাংশকে বাংলাদেশী ছাপ দিয়ে বি এস এফ-কে দিয়ে সীমান্তের ওপারে চালান করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন থাকলেও তাঁরা খবর পাচ্ছেন না। বিভিন্ন সূত্রে অনেক পরে খবর পেয়ে নথিপত্র নিয়ে দরবার করার পর অনেককেই বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হচ্ছে বি এস এফ। যাঁরা খবর পাননি বা নথিপত্র দেখিয়ে পুলিশকে বোঝাতে পারেননি, তাঁদের ভিন দেশে অসহায় অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে। বাংলাদেশী বলে দাগানোর জন্য প্রধানত বাছাই করা হচ্ছে মুসলিমদের। অর্থাৎ ধর্মে মুসলিম আর ভাষা বাংলা হলেই চোখ বুজে বাংলাদেশী ছাপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকলেও মানা হচ্ছে না। ফলে বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে এক তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি 'বাংলাদেশী ভাষা'র অনুবাদক চেয়ে বঙ্গভবনে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর পরিচালিত দিল্লী পুলিশের একটি থানা। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে দিল্লীতে আটক কয়েকজনের কাছে বাংলায় লেখা কিছু কাগজপত্র পেয়েছে পুলিশ। সেগুলির পাঠোদ্ধারের জন্য অনুবাদক দরকার। তার জন্যই এই চিঠি। বিজেপি নির্লজ্জভাবে দাবি করেছে, ওই চিঠির ভাষা একদম ঠিক। কিন্তু যদি 'বাংলাদেশী ভাষা'র অস্তিত্ব থেকেই থাকে, তবে তার অনুবাদক বঙ্গভবন কী করে জোগাড় করবে, এর উত্তর বিজেপি দিতে পারেনি। 'বাংলাদেশী ভাষা' বলতে বাংলা ভাষাকেই বোঝানো হয়েছে। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ভাষাগুলির অন্যতম বাংলা ভাষা। যে ভাষায় লেখা গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে দেশ গ্রহণ করেছে, সেই ভাষাকেই 'বাংলাদেশী ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন ওই থানার পুলিশ অফিসার। শুঁড়ির সাক্ষী মাতালের মতো দিল্লী পুলিশের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিজেপি'র মুখপাত্র অমিত মালব্য। তিনি এত বড় ভাষাবিদ যে বাংলা ভাষাকে ভাষা বলেই মনে করেন না! কারণ বাংলা ভাষার হাজারো রূপভেদ। অমিত মালব্য বোধহয় জানেন না হিন্দিরও হাজারো রূপভেদ আছে। কমবেশি সব ভাষারই এমন রূপভেদ থাকে। মালব্যের নির্বোধ ব্যাখ্যা অনুযায়ী পৃথিবীতে কোনও ভাষাই আর ভাষা থাকে না। অতএব এটা স্পষ্ট যে বাংলাভাষীদের ওপর জুলুমবাজি সচেতন প্রয়াসেরই অংশ। বাংলাভাষী ভারতীয়দের বাংলাদেশী বলে জিগির তুলে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে দেশে বাংলাদেশী মুসলিম ভরে যাচ্ছে। এটাকে ব্যবহার করে বিজেপি ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আরও তীক্ষ্ণ করতে চাইছে।

ভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু জাত ও বহু বর্ণের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। কিন্তু ২০১৪ সালে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ধর্ম, জাত, ভাষা ও বর্ণ নিয়ে বিভাজন শুরু হয়েছে। সময় যত এগিয়েছে, বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি তত স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে। প্রথমে ধর্মীয় বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হতে মানুষ ভেবেছিল এটা সংখ্যাগুরু ধর্মের সাথে সংখ্যালঘু ধর্মের ব্যাপার। ব্যাপারটা এমন যেন সংখ্যালঘুরা সবাই ভিনদেশী, সমস্ত সংখ্যালঘুদের উৎখাত করে ভিনদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বা অন্য কোনও ব্যবস্থা নিয়ে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে সংখ্যাগুরুদের একত্রিত হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দলীয় কর্মীদের একাংশ ছাড়া সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়নি। তারপর শুরু হলো সংখ্যাগুরুদের মধ্যে জাত ও বর্ণের বিভাজন। বিভাজনকারীরা তাদের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়ে বিভাজন প্রক্রিয়াকে আরও সূক্ষ্ম জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবারে ভাষাগত বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কর্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক রাজ্যের মধ্যে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর চরম অত্যাচার করা হচ্ছে এবং কিছু ক্ষেত্রে মারধর করে মেরে ফেলাও হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। এই ব্যাপারে ওইসব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না। আর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত! আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি জানে যে তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার মতো জায়গায় নেই। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই অন্য কোনও বিরোধী শক্তি যেন পা রাখতে না পারে এই রাজ্যে সেটা তারা নিশ্চিত করতে চায়। বিজেপি না জিতলে ক্ষমতায় রাখতে হবে তৃণমূলকেই, এটাই বিজেপি'র দর্শন। তাই ঠিক এই সময়েই 'ভাষা আন্দোলন'-এর অস্ত্র বিজেপি তুলে দিল তাঁর হাতে, যাঁকে স্বয়ং আর এস এস প্রধান 'মা দুর্গা' বলে সম্বোধন করেছেন। □

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
53rd Year, 4th & 5th Edition, August-September, 2025
Regd. No. : 18484/71

এ আই এস জি ই এফ-এর
ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি সভার রিপোর্ট

বিগত ১৬-১৭ আগস্ট, ২০২৫ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সুকোমল সেন ভবনে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনের এই সভা পরিচালনা করেন সভাপতি সুভাষ লাম্বা সহ ১০ জন সহ-সভাপতি নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতে কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন, সারা ভারত রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়াকার্স ফেডারেশনের সভাপতি নেপাল দেব ভট্টাচার্য, এ আই এস জি ই এফ-এর প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ বিনয় ভট্টাচার্য, এ আই এস জি পি এফ-এর নেতা আর. শ্রীনিবাসন এবং উত্তরাখণ্ড ও কাশ্মীরের মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে উদ্ভূত বন্যায় মৃতদের প্রতি এবং ইজরায়েলি আক্রমণে গাজায় নিহতদের সহ অন্যান্য বিশিষ্ট প্রয়াতদের প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার তাঁর প্রাথমিক প্রস্তাবনায় প্রথমেই ৯ জুলাই, ২০২৫-এর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সাফল্যের জন্য সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বিস্তৃত ভাবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। উল্লেখ করেন শ্রম আইন সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, দেশ ও রাজ্যের সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অভয়া কাণ্ড এবং তৎপরবর্তীতে নৈরাজ্যের উল্লেখ করেন। সরকার কৃষির কর্পোরেটাইজেশন ও বিদ্যুতের বেসরকারীকরণের উদ্যোগ জারি রেখেছে, দেশ জুড়ে আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। সর্বোপরি সরকার দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে নষ্ট করতে চাইছে। সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার উপর ২৪টি রাজ্যের ৪০ জন সদস্য তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে এরাজ্যের কর্মচারীদের পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা, প্রশাসনের দুর্নীতিকরণ ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লাগাতার লড়াই আন্দোলনের উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যুগ্ম সম্পাদক ছাড়াও এই সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সুতপা হাজরা ও পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ রায়।

১৬ আগস্ট কেন্দ্রীয় দপ্তরে কমরেড অরবিন্দ ঘোষ নামাঙ্কিত লাইব্রেরির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব কে এন উমেশ। ১৭ আগস্ট এ আই-এর উপর স্লাইড শো-এর মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ

দেবব্রত রায়

আলোচনা করেন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব সুদীপ দত্ত। সমগ্র আলোচনা গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। সভার দ্বিতীয় দিনে ৭টি প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হয়।

১৭ আগস্ট বিকেল ৪টায় সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উক্ত সভা থেকে ১১ দফা দাবিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়—

১। চারটি শ্রম কোড বাতিল কর। ২। পি এফ আর ডি এ বাতিল কর, এনপিএস/ইউপিএস নয়, আমাদের দাবি ওপিএস। ৩। সমস্ত চুক্তির কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। ৪। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণ করা চলবে না। ৫। অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করতে হবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পে রিভিশন করতে হবে। ৬। বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। ৭। সমস্ত সরকারী কর্মচারী (চুক্তিভিত্তিক সহ) ও অবসরপ্রাপ্তদের ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনতে হবে। ৮। নয়া শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করতে হবে ইত্যাদি।

উক্ত ১১ দফা দাবির সমর্থনে ২৩ সেপ্টেম্বর সব রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরে একদিনের ধর্ণা কর্মসূচী প্রতিপালিত করতে হবে।

২৯ আগস্ট অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের দাবিতে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ ও গেট সভা আয়োজন করতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫-এর পূর্বে প্রত্যেক সংগঠন তাদের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি সদস্যপিছু ২ টাকা হারে সদস্য চাঁদা কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা করবেন।

জাতীয় সম্মেলন আসার আগে প্রতিটি সংগঠন তাদের রাজ্য সম্মেলন সংঘটিত করবে।

এবারের জাতীয় সম্মেলন মহারাষ্ট্রের সিরিডি শহরে অনুষ্ঠিত হবে। সদস্য সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারিত হবে। প্রতিনিধির এক-তৃতীয়াংশ মহিলা হওয়া আবশ্যিক। কোনো মহিলা প্রতিনিধির বদলে পুরুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

এমপ্লয়িজ ফোরাম-এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। আগামীতে হিন্দি ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই এমপ্লয়িজ ফোরাম প্রকাশিত হবে।

সুকোমল সেন ভবনের জন্য বরাদ্দ প্রতিটি সংগঠনের অবশিষ্ট ফান্ড অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে।

শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মচারীর কাছে পৌঁছোতে হবে। প্রতিটি রাজ্য এক্ষেত্রে নিজস্ব টিম গঠন করবে।

সংগঠনের কাজে মহিলা সদস্যদের যোগদান বৃদ্ধি করতে হবে।

কিছু রাজ্যে সংগঠন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যায় নিয়মিত ব্যবধানে সভা করে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

প্রতিটি রাজ্য সরকারী কর্মচারী (চুক্তি সহ) এবং পেনশনারদের ক্যাশলেস স্বাস্থ্য বীমার অধীনে নিয়ে আসতে হবে।

সংগঠনের কার্যক্রম প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট মিডিয়া সেল গঠন করতে হবে। রাজ্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনার রিপোর্ট দ্রুত কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তার ভূমিকার বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

চুক্তির কর্মচারীদের নিয়মিত করণের দাবিকে মুখ্য দাবি রূপে গ্রহণ করে চুক্তির কর্মচারীদের নিয়ে বিশেষ অধিবেশন জাতীয় সম্মেলনের সাথেই আয়োজিত হবে।

সংগঠনের আয়-ব্যয় ও নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। □

সুতপা হাজরা

উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সফল ব্লকগুলির সম্মেলন

ভগবানপুর-১, পূর্ব মেদিনীপুর

মাটিগাড়া, দার্জিলিং

উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম

নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মগরাহাট ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।